লাঞ্ছিত মানবাত্মা

সৌমেন নাগ

পুনশ্চ

৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন

কলকাতা-৭০০ ০০৯

FOREWORD

Custodial crime is not a new phenomenon but today it has assumed startling and enormous proportions. It has taken various forms such as torture in custody, rape, custodial death and brutal and inhuman treatment of prisoners, whether undertrails or convicts. Unfortunately, this brutality which is perpetrated on helpless and defenceless prisoners has desensitised the society and the conscience of all right thanking men revolves against it. There is no greater affront to human dignity than torture and cruel and inhuman punishment or treatment and it deserves the strongest condemnation. Fortunately, the media during the last few years has tried to bring such cases of custodial crime to light through investigative journalism and tried to awaken the conscience of mankind and the judiciary, too, in its turn has come down heavily, in no uncertain terms, on those who are perpetrators of custodial crime. Over the last few years, we see an increasing sensitivity on the part of judges to suffering of victims of custodial crime. Over the last few years, we see an increasing sensitivity on the part of judges to suffering of victims of custodial crime. But even so, it is unfortunate to find that custodial crime against prisoners and particularly women is on the increase, largely because of the brutalisation of the society and the utter depravity of the guardians of law.

The Constitution of India guarantees the right to life and personal liberty in the most glorious terms and this guarantee has been interpreted by the Supreme Court of India in Menaka Gandhi's case a requiring procedural due process of law before any person can be deprived of his life or personal liberty. The expressions "life" and "personal liberty" have received the widest interpretation. Menaka Gandhi's case has been the harbinger of a most remarkable evolution of human rights juris-prudence and there have been numerous cases including Bihar Blinding Cases, cases of disappearance and torture and custodial death where the Supreme Court has not only directed steps to be taken for

punishment of the guilty but also provided relief and rehabilitation to the victims of custodial bestiality. Apart from Article 21, there is Article 22 of the Constitution which guarantees protection against arrest and detention without informing the person concerned of the grounds of arrest. That Article also gives the right to consult and be defended by a legal practitioner of one's own choice. Any person arrested or detained is directed to be produced before the nearest Magistrate within 243 hours of his arrest. The Code of Criminal Procedure also provides safeguards to the arrested person and the National Commission of women has recently recommended amendments to the Code of Criminal Procedure for safeguarding women against police excesses. It will thus be seen that there are numerous provisions in the Constitution and the laws which provide guarantees for the protection of those who are arrested and/or detained. But unfortunately, most of these provisions have remained paper-tigers without teeth and claws because there has been woeful lack of implementation of these protections and safeguards. Moreover, custodial crimes often do not come to light because they are perpetrated in the dark cells of lock-ups and prison house and often enough, those who are the victims of custodial crimes are afraid of complaining to the Magistrate lest they might be subjected to further ill treatment and torture by the police are all too powerful and the victims of custodial crimes do not have any witness to the commission of such crimes. There is, therefore, all the greater responsibility on the judiciary to see that custodial crimes do not go undetected and unpunished.

The need of the hour is that the constitutional and legal protections and safeguards must be strictly implemented by all those who are concerned with the arrest, detention and custody of people generally and particularly of the poor and vulnerable sections of the society. It is necessary that the guardians of law and the custodians of lock-ups and prison-houses should be made aware of the constitutional and legal-lights of the people and their coarsened conscience in sensitised. It is generally the poor and disadvantaged who are the victims of custodial crimes because there is no one to care for them and to look after them and there is no one to protect them. The voluntary agencies which work at the grassroot level are painfully aware of the hardships suffered

by the poor and the deprived who are generally the victims of torture, beating crueland inhuman treatment and even custodial death and the Government and the judiciary should, therefore, make it possible for them to periodically visit lock-ups and prisonhouses and to meet prisoners in order to find out whether they have been subjected to any custodial crime. Training courses should be undertaken by the Government with the help of the voluntary agencies to educate the police and the enforcement officials in human rights so that they begin to respect the human rights of prisoners and observe them.

These and many other related issues have been dealt with in this judgement of the Calcutta High Court and it would serve its noble purpose if it can create a certain awareness amongst the people in regard to their constitutional an legal rights in case of arrest, detention and custody and educate and sensitise the police and the enforcement officials so that the protections and safeguards guaranteed to the poor and the disadvantaged do not remain merely teasing illusion and promise of unreality but they become meaningful and effective in order to usher in a new era where human rights will prevail and the rule of law will become a living reality.

I am very happy to note that Mr. Justice Basu is trying to see that not only the people of West Bengal, but also people all over the country, come to know through this book about their constitutional and legal rights and safeguards and the police and enforcement officials begin to respect them. I am sure that this book will make a very useful contribution towards raising the awareness of the people and eradicating custodial bestiality by the guardians of law and order.

(P. N. BHAGWATI)

লিগ্যাল এইড সার্ভিসেস ওয়েস্ট বেঙ্গল

৫, কিরণ শঙ্কর রায় রোড, কলিকাতা—৭০০০০১

সৌমেন নাগের "লাঞ্ছিত মানবাত্মা" একটি শুভ প্রচেষ্টা। বই অনেকেই লেখা হয়—প্রামাণ্য দলিল হিসেবে যা টিকে থাকে তা অতি দুর্লভ এবং অমূল্য। পাণ্ডুলিপিটা পড়তে পড়তে একটা শিহরণ অনুভব করেছি—যেটা সুখকর রোমাঞ্চ নয়—আতঙ্কজনক এবং বিস্ময়ের। তথ্যের ঠাসবুনুনিতে শুধু যে বইটির বিশেষত্ব তা নয়। সংবিধানে স্বীকৃত ও ঘোষিত মানবাধিকার লঙ্ঘিত হওয়ার যে যে দৃষ্টান্ত গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন তাতে সন্দেহ হয়েছে আমরা সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক, প্রজাতন্ত্রী এবং আইনের শাসন ও শৃঙ্খলাবদ্ধ রাষ্ট্রের নাগরিক কি না? নাগরিকের সাংবিধানিক রক্ষাকবচ উপেক্ষা করে, নাগরিকদের ব্যক্তি মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে, আইনের শাসন বজায় রাখার দোহাই দিয়ে আরক্ষা কর্তৃপক্ষ তাদের হেফাজতে আইনের অপপ্রয়োগে ধৃতদের উপরে যে নির্মম অত্যাচার করেন, শারীরিক নিগ্রহ করেন, বন্দী বা ধৃতব্যক্তিদের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটনা তার হিসেব পেতে হলে সৌমেন নাগের এই সংকলন অনাগত ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও রসদ যোগাবে। এই সংকলনের সঙ্গে আরক্ষা হেফাজতে ধৃত ব্যক্তিদের অধিকার ব্যাখ্যা করে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দিলীপকুমার বসুর সঙ্গে ঐতিহাসিক রায় এবং ঐ মামলায় যে সব নজির পেশ করা হয়েছে তার একটি বিশদ তালিকা থাকায় গবেষক, সমাজসেবী ও আইনজীবীদের কাছে বইটা অবশ্যপাঠ্য এবং ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে থাকাটা অপরিহার্য হবে।

ইংরেজ আমলে সন্দেহবশে ধৃত ব্যক্তিকে পুলিশ হেফাজতের স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্যে যে ধরণের অত্যাচার করা হত সেই 'ট্র্যাডিশন' আজও অব্যাহত। শুধু অব্যাহত বললে সবটা বলা হয় না। তদন্তের সূত্র খুঁজতে, স্বীকারোক্তি আদায় করতে আইনসম্মত ও আইনসঙ্গত অনুমোদন ছাড়াই যে সব প্রক্রিয়া অবলম্বিত হয় তার প্রচলিত নাম হল থার্ড ডিগ্রি বা তৃতীয় পর্যায়। যে ভাবে থার্ড ডিগ্রির যদৃচ্ছ ব্যবহারের খবর এতাবৎ পাওয়া গেছে তা আতঙ্কজনকভাবে ক্রমবর্দ্ধমান। কোনও সংচিন্তাশীল নাগরিকরাই এই বর্বর পদ্ধতিকে সমর্থন করেন না। কোনওমতেই পুলিশ হেফাজতে ধৃত ব্যক্তির প্রতি বলপ্রয়োগ ও দৈহিক নিগ্রহ সমর্থন করা যায় না। দেশের সংবিধান বিরোধী এবং আইনের সুরক্ষা নস্যাৎ করা, যুক্তিহীন পাশবিক আচরণ অতি অবশ্যই আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের রক্ষাকবচ বিরোধী।

বিচারবিভাগের কাছে পুলিসি হেফাজতে অত্যাচারের অভিযোগ স্বাধীনতার পরবর্তী অর্ধশতকে এত বেশি এসেছে যে বিভিন্ন হাইকোর্ট ও সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতিরা পুলিসি প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যে বিভিন্ন সমাজসেবীর আনা জনস্বার্থ মামলা শুনে জনকল্যাণে বিচক্ষণতার সঙ্গে রায় দিয়েছেন।

সৌমেন নাগের এই সংকলন গ্রন্থে নদীয়া জেলার প্রাচীন মায়াপুরের আইনজীবী ও সমাজসেবী প্রতুলচন্দ্র সিনহার আনা একটি জনস্বার্থ মামলার বিবরণ, বক্তব্য ও রায় আলোচিত হয়েছে। প্রতুলচন্দ্রের জনস্বার্থ মামলায় কলকাতার দৈনিক সংবাদপত্র আজকাল, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি পক্ষভুক্ত হন। এরা রাজ্যের জেল হেফাজতে বিচারাধীন বন্দীদের অবস্থার প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই মামলার শুনানির পরবর্তী পর্যায়ে আইনজীবী মার্তণ্ডপ্রতাপ চক্রবর্তী পুলিসি হেফাজতে বর্বরতার দৃষ্টান্তও উল্লেখে আবেদন করেন। পরবর্তী পর্যায়ে জেল হেফাজতে নিরপরাধ বন্দীদের প্রশ্ন জনস্বার্থ মামলা সংযোজিত হয়। জেল হেফাজত থেকে নিরপরাধ অনেক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়। ব্যবস্থা করা হয় পুনর্বাসনের—বিভিন্ন সমাজসেবীরা এগিয়ে আসেন—এগিয়ে আসেন সমাজসেবী সংগঠন।

বর্তমান সংকলন গ্রন্থে পুলিসি নির্যাতনের প্রতিরোধে বিচারপতি দিলীপকুমার বসুর নীতিনির্ধারক একটি ঐতিহাসিক রায় নথিবদ্ধ হয়েছে। ২ জুন, ১৯৯২ বিচারপতি বসুর রায়ে মানবাধিকার ও নাগারিক অধিকারের সুরক্ষায় হেফাজতে পুলিসি নিগ্রহ প্রতিরোধের জন্যে বিধিব্যবস্থার নীতি নির্দেশিকা আছে। নীতি নির্দেশিকা রূপায়ণে রাজ্য সরকার পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছেন। এই সংকলন গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য হল আইন ও সংবিধানের বিভিন্ন মৌলিক অধিকার সম্পর্কে নাগরিকদের সচেতন করা। আর সেই সঙ্গে আরক্ষা বাহিনীর লোকেদের সতর্ক করা যাতে বন্দী বা ধৃতদের প্রতি আচরণে অধিকারের সীমা তাদের দ্বারা লঙ্ঘিত না হয়।

অতি সতর্ক থাকা সত্ত্বেও যদি কিছু মুদ্রণ প্রমাদ থেকে গিয়ে থাকে বা ত্রুটি বিচ্যুতি থাকে সহৃদয় পাঠক সেজন্যে আমাদের মার্জনা করবেন এই প্রত্যাশা রাখি।

ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি—আদালতে জনস্বার্থ মামলাকে বিচারগ্রাহ্য করার ব্যাপারে যিনি ভগীরথ—সেই শ্রদ্ধেয় পি এন ভগবতী এই সংকলনটির মুখবন্ধ লিখে আমাদের চিরন্তন কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি যে সংকলনটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করার জন্যে কলকাতা হাইকোর্টের দুই আইনজীবী প্রদীপ্তকুমার রায় ও প্রভাতকুমার সামন্তের সক্রিয় সহযোগ, প্রকাশক, মুদ্রক ও লিগ্যাল এইড সার্ভিসেস ওয়েস্ট বেঙ্গলের সহকর্মীদের স্বীকৃতি বিনা দ্বিধায় না জানালে দায়মুক্তি অসম্ভব।

১লা মাঘ, ১৪০৩
লিগ্যাল এইড সার্ভিসেস, ওয়েস্টবেঙ্গল,
৫, কিরণশংকর রায় রোড,
কলিকাতা—১

গীতানাথ গাঙ্গুলি
(কার্যনির্বাহী সভাপতি,
লিগ্যাল এইড সার্ভিসেস, ওয়েস্টবেঙ্গল)

নিবেদন

আমাদের পূর্বপুরুষেরা মানুষের পরিচয় লিপিতে বলেছিলেন "অমৃতস্য পুত্রাঃ"—আমরা অমৃতের ফসল।

সৃষ্টির বাগিচাভূমিতে অমৃতের যে বীজ রোপিত হয়েছিল সেই বীজ স্বাধীনতার বীজ, আর এই স্বাধীনতাই জন্ম দিয়েছিল মনুষ্যত্বের, অথচ সেই মনুষ্যত্বই আজ কংসের কারাগারে বন্দি। স্বাধীনতা আজ বিপন্ন, মনুষ্যত্ব মুমূর্ষু রোগীর মতন অসহায় আর্তির চাউনি নিয়ে ধুঁকছে। রাষ্ট্রের অভিভাবকের পোষাক গায়ে চাপিয়ে শাসনের নামে একদল মানুষ মানবিকতাকে শৃঙ্খলিত করে রাখতে চাইছে। এই সমস্ত অভিভাবকদের সুখনিদ্রায় যাতে কোন ব্যাঘাত না ঘটে তার জন্য প্রাচীন ও মধ্যযুগেও যেমন প্রহরীদের দিয়ে নিরাপত্তার বলয় রচিত হত তেমনি গণতান্ত্রিক আধুনিক বিশ্বেও গণতন্ত্রের অভিভাবকদের জন্য একই উদ্দেশ্যে নিরাপত্তার পরিখা সৃষ্টি করা হচ্ছে, আধুনিক অভিধানে এদের পরিচয় পুলিশ থানা। অথচ গণতন্ত্রে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করাই ছিল থানার প্রাথমিক দায়িত্ব।

গণতন্ত্রে মানুষের কথাই শেষ কথা, মানুষের হৃদয়ের ভাষাই রাষ্ট্রের ভাষা—এই পরম সত্যটিকে বিদ্রূপ করতেই যেন পুলিশের কথাই শেষ কথা—এই দানবীয় ঘোষণায় রাষ্ট্রের অভিভাবকেরা মরিয়া হয়ে উঠেছে, পুলিশ হাজতে আটক ব্যক্তিদের মৃত্যুর সংখ্যা যে ভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে তা মানব সভ্যতার অপমৃত্যুকেই ডেকে আনছে। গণতন্ত্র রূপান্তরিত হচ্ছে প্রহসনে।

মানুষ ঘোষণা করছে নিজের পরিণত বুদ্ধির কথা, দাবি করছে আপন মেধায় সে প্রকৃতিকে পরিণত করেছে তার সেবাদাসে অথচ সেই মানুষই আবার গণতন্ত্র রক্ষার উর্দি পরে নিজেই বর্বরতার দাসে পরিণত হচ্ছে। অসহায় বন্দি মানুষকে পিটিয়ে হত্যা করা হচ্ছে। এদের পাশবিকতায় ধর্ষিতা হচ্ছেন মা-বোনেরা। মানবসভ্যতা থানাগুলিতে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে চলেছে। যন্ত্রণা কাতর মানুষগুলির করুণ আর্তনাদও এদের বিবেকহীন হৃদয়ে মনুষ্যত্বের স্পন্দন সৃষ্টি করতে পারছে না। কি এক ভয়ঙ্কর পাশবিক শক্তি তাদের মনুষ্যত্বকে হত্যা করে চলেছে, মানবিক মূল্যবোধ এইসব ধর্ষকামী ও মর্ষকামী মানুষের হাতে প্রতিনিয়ত লাঞ্ছিত হচ্ছে।

মানুষের শারীরিক নিরাপত্তার জন্য গড়া হয়েছিল রাষ্ট্রের মিলিশিয়া। এদের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল পারসন্যাল ডিগ্‌নিটি বা ব্যক্তির মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব।

রাজনৈতিক প্রভুরা নানা অজুহাতে গণতন্ত্রের উর্দি পরা প্রহরীদের দিয়ে এই পারসন্যাল ডিগ্‌নিটিকে আক্রমণ করে চলেছেন। অথচ এই পারসন্যাল ডিগ্‌নিটি তথা ব্যক্তিসত্তা মানুষের জীবনে কর্ণের কবচ কুণ্ডলের মতন সহজাত বর্ম। মানুষের ব্যক্তিসত্তার স্নায়ুগুলিকে উদ্দীপ্ত করা প্রয়োজন। তবেই সে মানুষ হিসাবে নিজের অধিকারকে চিনে নিতে শিখবে। ঘরে ঘরে জন্ম নেবে স্পার্টাকাস, অত্যাচারীর হাত থেকে অত্যাচারের দণ্ডকে কেড়ে নিতে তার সুপ্ত অধিকার বোধকে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করতে জাগ্রত করতে জানবে।

পাথরের মধ্যেই তো সৃষ্টি হয়েছিল মাইকেল অ্যাঞ্জলোর পিয়োতা। মর্মর পাথরের পাহাড়ে এই পাথরটিকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বের করেছিলেন মাইকেল অ্যাঞ্জলো। তিনি তার শিল্প সুষমার অন্তঃদৃষ্টির মাধ্যমে ঐ পাথরের বুকে ক্রুশ থেকে নামান করুণাঘন যীশুকে মায়ের কোলে দেখতে পেয়েছিলেন। পাথরের অপ্রয়োজনীয় অংশকে ছেঁটে দিয়ে করুণা প্রবাহকে শিল্প-মঞ্জুষায় জীবন দান করেছিলেন।

আমরাও তো আমাদের জীবনে এমন এক মাইকেল অ্যাঞ্জলোকে খুঁজে চলেছিলাম। যিনি আমাদের মনের কোণে জমে থাকা বিবেক-হীনতার পাথরগুলিকে ছেঁটে ফেলে মানবিক মূল্যবোধের দীপ্তিকে প্রকাশ করে দিতে পারেন। কলকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি দিলীপকুমার বসু যেন সেই মাইকেল অ্যাঞ্জলোর মতন মানবিক মূল্যবোধ-গুলিকে বিবেকহীন, প্রতিবাদহীন, প্রতিরোধহীন শিলাভূত মনুষ্য সমাজের মনুষ্যত্বের অবয়বকে প্রাণদান করতে এগিয়ে এসেছেন।

বিচারপতি বসু হাজতে মৃত্যুর মতন বর্বর ঘটনাগুলির বিরুদ্ধে মানুষের অধিকারের স্নায়ুতন্ত্রগুলিকে সজাগ করে দিতে চেয়েছেন। বাক্‌রুদ্ধ মানুষের মুখে যে তিনি শুধু ভাষা দিয়েছেন তাই নয় এই বর্বরতার প্রতিরোধে সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দিয়েছেন পক্ষপাত অস্ত্র। লাঞ্ছিত মানবাত্মাকে মর্যাদা দিতে বিচার বিভাগকে তার রক্ষাকবচ রূপে উপস্থিত করেছেন। বিচার বিভাগও যে মানুষের হৃদয়ের স্পন্দনকে তার হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারে সেই লুপ্ত বিশ্বাসকে আবার বিশ্বাসের সিংহাসনে স্থাপন করেছেন।

সমুদ্রমন্থনে দেবতাদের জন্য অমৃত কলস উঠে এলেও তাকে রক্ষা করতে অসুর শক্তির বিরুদ্ধে দেবতাদের নিয়ত সংগ্রাম করতে হয়েছিল। বিচারপতি বসুর এই রায় মুমূর্ষু মানবাত্মার জন্য অমৃত প্রবাহ আনলেও একে ব্যবহারের দায়িত্ব নিতে হবে মনুষ্যত্বের পূজারীদের। এখানেও দানবীয় শক্তি এই অমৃতফসলকে হরণ করতে ওঁৎ পেতে আছে। বেগবতী গঙ্গা সিন্ধুর জলপ্রবাহকে সেচ সিঞ্চনের মাধ্যমে ব্যবহার করে যেমন গড়ে উঠেছিল মানব সভ্যতা তেমনি এই রায়ের সঞ্জীবণী সুধাকে নিয়ে যেতে হবে লাঞ্ছিত মানবাত্মার মুক্তির সংগ্রামে। আর সেই প্রেরণার ফসল রূপেই এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি রচনার উৎসাহ পেয়েছি।

আমি আইনজ্ঞ নই। আইনের ভাষাও আমার অজানা, কিন্তু লাঞ্ছিত মানবাত্মার প্রতি সমব্যথীরূপে বিচারপতি বসুর এই রায়ের মধ্যে যে মানুষের ভাষাকে খুঁজে পেয়েছি তাকেই প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি। আইনের অনেক শব্দের সহজ প্রতিশব্দ যে খুঁজে পাইনি সেটা আমারই অজ্ঞতা, তাই অনেক ক্ষেত্রেই পাঠকের প্রতি যে আমি সুবিচার করতে পারিনি সেটা অকপটে স্বীকার করে নিচ্ছি। তবে লেখকের এই অক্ষমতা যে পাঠকের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টির প্রলেপে ধন্য হবে এই দুরাশা কেন জানি মনের কোণে বাসা বেঁধে আছে।

মানুষকে মানুষ বলে চেনার হাতেখড়ি হয়েছিল আমার মায়ের কাছে। খুব ছোটবেলায় তাঁর কাছে শুনেছিলাম ভিখারীকে ভিক্ষা দেওয়ার মধ্যে অনুকম্পার জায়গা নেই। আমাদের সমাজে একজন মানুষকে যদি ভিক্ষা করতে হয় তবে সেই সমাজের সদস্য হিসাবে আমার দায়বদ্ধতার জন্যই আমার অংশ থেকে তাকে তার অংশ দিতে হয়। সেই প্রখর ব্যক্তিত্বময়ী মহিলা আজ আর নেই। বইটি লিখতে গিয়ে তাঁর নানা কথা আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছে।

অনুজ প্রতিম সহকর্মী বিমলাপ্রসাদ ভট্টাচার্য যে ভাবে এই পুস্তকটি রচনায় সাহায্য করেছেন তা এককথায় অচিন্তনীয়। অগ্রজ প্রতিম রূবেন চক্রবর্তীর উৎসাহ আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছে।

সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি পি এন ভগবতী এই পুস্তকটির জন্য যে মুখবন্ধটি লেখার উদারতা দেখিয়েছেন তা আমার জীবনের এক দুর্লভতম প্রাপ্তি।

লিগাল এইড সার্ভিস, ওয়েস্ট বেঙ্গল (LASWEB)-এর কাছে আমি গভীরভাবে ঋণী। তাদের কাছ থেকে পেয়েছি নানা তথ্য। এর অন্যতম কর্ণধার গীতানাথ গাঙ্গুলী আইন জগতের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তিনি যেভাবে প্রতিনিয়ত পরামর্শ দিয়েছেন বিভিন্ন মামলার সূত্রগুলি তার এত ব্যস্ততার মধ্যেও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছেন তা আমার অভিজ্ঞতার ঝুলিতে এক অভূতপূর্ব সংযোজন।

বিখ্যাত আইনজীবী ও সমাজসেবী দেবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় স্বেচ্ছায় এই পুস্তকটিকে পাঠকের দরবারে উপস্থিত করার জন্য সম্পাদনার দায়িত্বটুকু নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন, এর জন্য আমি চির ঋণী। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিটি ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন। বিভিন্ন তথ্য অনুসন্ধানের দুরূহ দায়িত্বভার নিজের হাতে তুলে নিয়ে পুস্তকটি রচনায় নিজেকে আড়ালে রেখে সাহায্য করেছেন।

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির কর্মীবৃন্দ বিশেষ করে তার কর্ণধার সুজাত ভদ্রের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাদের নিরলস, কর্মযজ্ঞ এই রচনাকে প্রেরণা যুগিয়েছে। গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির শিলিগুড়ি শাখার কর্মীবন্ধুরাই আমাকে বিচারপতি বসুর এই ঐতিহাসিক রায়ের খবরটি পৌঁছে দিয়েছিলেন, তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

'পুনশ্চ' প্রকাশনীর কর্ণধার শঙ্করীভূষণ নায়ক আমার কাছে এক পরম বিস্ময়। প্রজ্ঞা, মননশীলতা, সৌজন্যবোধ সর্বোপরি মানুষের প্রতি তার মমত্ববোধের সমন্বয় শঙ্করী-বাবুকে আমার চোখে এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বরূপে স্থাপন করেছে। এত বড় একটি প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হয়ে তার শত ব্যস্ততার মধ্যেও এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপির প্রতিটি অক্ষরকে পাঠযোগ্য করার জন্য তিনি যে ভাবে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়েছেন তা আমার জীবনে এক অবিস্মরণীয় ঘটনার প্রতীক হয়ে থাকবে। তার প্রতি আমার ঋণ কোনভাবেই পরিশোধযোগ্য নয়।

মুদ্রণ বিভাগের কর্মীদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ, তাদের কর্মদক্ষতা ও পরিশ্রমের জন্য পুস্তকটি প্রকাশিত হল।

সবশেষে কৃতজ্ঞতা জানাই সেই মহিলাকে তিনি সংসারের সব দায়িত্ব নিজের মাথায় তুলে' নিয়ে আমাকে এই পুস্তকটি রচনায় নীরবে সাহায্য করে গেছেন।

নমস্কারান্তে
সৌমেন নাগ

'ননীকুটীর'
অতুলপ্রসাদ সরণী
ডাকঘর ঃ রবীন্দ্রসরণী
শিলিগুড়ি
২২.১.১৯৯৭

অধ্যায় সূচী

	পৃষ্ঠা
১. মানুষের অধিকার	১৭
২. পুলিশ ও মানবতা	২২
৩. জনস্বার্থে সুবিচার	২৬
৪. বন্দী নির্যাতন	৩০
৫. লক আপে মৃত্যুর তালিকা	৩৪
৬. উপেক্ষিত মানবাধিকার	৩৮
৭. পুলিশের এক্তিয়ার	৪৪
৮. হাজতে হত্যার খতিয়ান	৪৯
৯. স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন প্রদত্ত মৃত্যু-তথ্য	৫৫
১০. পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু জেলায় জেলায়-এক সরকারী প্রতিবেদন	৬৬
১১. জাতি সংঘের মহাঘোষণা তথা রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন	৮২
১২. বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে	৮৫
১৩. জনস্বার্থ সংক্রান্ত মামলা	৯২
১৪. উপেক্ষিত সাংবিধানিক রক্ষাকবচ	৯৭
১৫. পুলিশ বিধি কি ও কেন?	১০২
১৬. পুলিশ হাজতে অত্যাচার	১০৫
১৭. ভারতীয় পুলিশ আইন ও অপপ্রয়োগ	১১১
১৮. পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ	১১৪
১৯. গণতন্ত্র ও প্রতিবন্ধকতা	১২২
২০. গ্রেপ্তার ও কাষ্টডি মেমো	১৩১
২১. এই ঐতিহাসিক রায়ের তাৎপর্য	১৪১

পরিশিষ্ট

ক. বর্ণানুক্রমিক নাম তালিকা	১৪৭
খ. মামলার সারণি	১৫৩
গ. জনসেবী সংস্থার নাম-সংক্ষেপ ও পরিচয়	১৫৫
ঘ. সালতামামি (সাল তারিখ উল্লেখে)	১৫৬
ঙ. পুস্তক-পত্র-পত্রিকার উল্লেখ	১৫৮

১

মানুষের অধিকার

মানুষের অধিকারের ঠিকানার সন্ধানে প্লেটোর "রিপাব্লিক" বইটি সম্বল করে মুক্তির সংগ্রামে বেরিয়েছিলেন বিদ্রোহী স্পার্টাকাস। প্রাচীন রোম থেকে যে ঠিকানার সন্ধানের চেষ্টা শুরু হয়েছে তা শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে আজো চলেছে। এ সন্ধান মানবাধিকারের মুক্তির সন্ধান। মানবাধিকার এখনও রাষ্ট্রযন্ত্রের কারগারের অন্ধকূপে ধুঁকছে।

বন্দি মানবাধিকারকে মুক্ত করবার চাবিগুচ্ছ। সত্যি বলতে কি তা আজও মানুষের হাতে আসেনি। প্রসঙ্গত, এব্যাপারে পুরোন দিনের কার্ল ভ্যালেন্টিনের বিখ্যাত প্রহসনের কাহিনী মনে পড়ে গেল।

জার্মানীর বিখ্যাত অভিনয় শিল্পী কার্ল ভ্যালেন্টিন ছিলেন প্রহসনের মাধ্যমে জীবন দর্শনকে ফুটিয়ে তোলার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। মানবাধিকারের মুক্তির চাবির সন্ধানে ভ্যালেন্টিনের একটি প্রহসনের দৃশ্যে আমাদের সংশয়াচ্ছন্ন মনকেই যেন আমরা দেখতে পাই। মনে হয় আমরা যেন কি হারিয়েছি। আর সেই হারান সূত্রেই আমরা কি ভাবে বিড়ম্বিত হচ্ছি।

ভ্যালেন্টিনের সেই প্রহসনের দৃশ্যকেই এখানে হাজির করা যাক,

অন্ধকারে ঢাকা রঙ্গমঞ্চ। মঞ্চের একধারে আলোর একটা ছোট বৃত্ত। সেই বৃত্তের মধ্যে ভ্যালেন্টিন ঘুরপাক খাচ্ছেন। সারা চোখে মুখে উদভ্রান্তির ছাপ। কিছু একটা হারিয়েছে। খুঁজে বেড়াচ্ছেন। পাচ্ছেন না।

একজন পাহারাদার উপস্থিত হল রঙ্গমঞ্চে। সে ভ্যালেন্টিনকে জিজ্ঞাসা করল কি করছ এখানে?

ভ্যালেন্টিন উত্তর দিলেন,"খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি।' ধমক দিয়ে উঠল পাহারাদার, 'কিন্তু কি হারিয়েছে?'

"আমার বাড়িতে ঢোকার চাবি।"

পাহারাদারও যোগ দিল ভ্যালেন্টিনের সাথে চাবি খুঁজতে। সেই ক্ষুদ্র আলোর বৃত্তের মধ্যে চাবি খুঁজে খুঁজে পাহারাদারটিও হয়রান হয়ে পড়ল। জিজ্ঞাসা করল। তোমার চাবিটা এখানেই হারিয়েছে তো?

'না' ভ্যালেন্টিন অম্লান বদনে জবাব দিলেন।

তবে?

ভ্যালেন্টিন অন্ধকারের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন "হারিয়েছে ঐ অন্ধকারে।"

তাহলে এখানে খুঁজে মরছ কেন? বিস্মিত কণ্ঠে পাহারাদার জিজ্ঞাসা করল। 'ওখানে আলো নেই যে', বিব্রত ভ্যালেন্টিন জবাব দিলেন।

আমরা যারা মানবাধিকারের হারান চাবিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি তাদের অবস্থাও প্রহসনে অভিনয় রত এই ভ্যালেন্টিনের মত। আমরা আমাদের আত্মাকে হারিয়েছি। তাকে খুঁজতে চাইছি। কিন্তু নিজের ছোট চেনাগণ্ডির বাইরে তাকে খোঁজার কথা ভাবতে পারছিনা। সেখানকার ঠিকানা জানিনা। কেউ জানায়নি।

২জুন ১৯৯২, সাল। যে চাবি গুচ্ছের সন্ধানে উদ্‌ভ্রান্ত মানুষ নিজস্ব ছোট্ট গণ্ডির মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছিল তাঁর হাতে উঠে এল যেন তার হদিস। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দিলীপকুমার বসু সংশয়ে আচ্ছন্ন মানুষের হাতে তুলে দিলেন মানবাধিকারের চাবিগুচ্ছের একটি হারান চাবির ঠিকানা। মার্তণ্ডপ্রতাপ চক্রবর্তী বনাম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মামলায় তিনি যে রায় দিয়েছেন তা ভারতীয় বিচার বিভাগে এক নবযুগ সৃষ্টি করেছে।

বিচারপতি দিলীপকুমার বসু তাঁর রায়ে আমাদের সমাজ ব্যবস্থার চকচকে পোষাকের নিচে যে দগ্‌দগে ঘা তার উপরের আবরণ যে নিপুণ চিকিৎসকের মতন উন্মোচন করে দিয়েছেন তাতে অনেকেই বিচলিত বোধ করবেন। কারণ রুগ্ন ও অনাহারে রক্তশূন্য দেহোপজীবিনী যেমন আলো আঁধারে সস্তা মেকআপের আবরণে মোহময়ী হতে চায় তেমনি সমাজের এই রুগ্ন দেহটাকে বাক্যছটার আড়ালে ঢেকে রাখতে চেয়েছেন ক্ষমতাসীন অতিসাবধানী বুদ্ধিজীবীরা আর এরই গুণগানের মধ্যে তারা নিজেদের ভবিষ্যতকে সুদৃঢ় করতে ব্যস্ত।

বিচারপতি বসু তার এই রায়ের মাধ্যমে যেন সাধারণ মানুষের হৃদয়ের স্পন্দনকে অনুভব করেই দ্বিধাহীন ভাষায় জানিয়েছেন ঃ

"সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষেরা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বিশেষ করে পুলিশ বিভাগের কাছে ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার পায় না। মহিলা, আদিবাসী হরিজন, ভূমিহীন কৃষক প্রভৃতি সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষেরা ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তাদের অধিকারগত সংগ্রামে পুলিশের সাহায্য পাওয়া তো দূরের কথা, ন্যায় বিচারের আশায় বিচারের দরজায় আসার পথেরও সন্ধান পায়না। এই সমস্ত দুর্বলতর শ্রেণী কায়েমী স্বার্থবাহী প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে আদালতে সরকারী দপ্তরে এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ সমাজের এই প্রধান জনস্রোতই জানেনা এদেশের আইন কি? কোন পথে আইনের দরজায় পৌঁছান যায়। এই মানুষগুলির কাছে তাই আইন এক শ্রেণীর মানুষ অথবা কর্তৃপক্ষের কায়েমী স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার বলেই গণ্য হয়। এরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে দেশের প্রচলিত বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের অবিশ্বাস ক্রমাগত বেড়ে চলেছে।"

বিচারপতি বসু কোন রাখ ঢাক গুরু গুরু করেন নি। সৎ ও সুদক্ষ চিকিৎসকের মত রোগের উৎস, কারণ এবং বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তাঁর অভিমত জানিয়েই তাঁর দায়িত্ব শেষ করেন

নি। সেই সাথে সুচিকিৎসকের মত নিরাময়ের ব্যবস্থাপত্রও দিয়েছেন। বিচারপতির এই রায়ে স্বাভাবিকভাবেই আলোচিত হয়েছে পুলিশের ভূমিকা।

'পুলিশ' শব্দটিই যেন আতঙ্ক, অথচ তা তো হবার কথা ছিলনা। আইন সভা আইন প্রণয়ন করবেন। বিচার বিভাগ আইনের ব্যাখ্যা করবেন ও আইন ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান দেবেন। পুলিশ আইনের অনুশাসন মেনে প্রত্যেক নাগরিক যাতে আইনের সুফল ভোগ করতে পারে তার দায়িত্ব পালন করবে। নাগরিকের নিরাপত্তার দায়ভার বহন করবে। তবে পুলিশ নিয়ে এত অভিযোগ কেন?

পুলিশ দপ্তরের মাধ্যমে সরকার আইনের অনুশাসনগুলি প্রয়োগের ব্যবস্থা করেন। বর্তমান পৃথিবীতে পুলিশের কাজকে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে। গণতান্ত্রিক দেশের পুলিশ ও এক-নায়ক তন্ত্রী দেশের পুলিশ। গণতান্ত্রিক দেশের পুলিশের দায়িত্ব সে দেশের জনগণ তাঁদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে যে আইন রূপায়ণ করে তা যথাযথ ভাবে পালিত হচ্ছে কিনা তার প্রতি নজর রাখা। যারা গৃহীত আইনকে অমান্য করবে তাদের গণতান্ত্রিক দেশের পুলিশ, বিচার বিভাগের কাছে হাজির করবে। কোন অবস্থাতেই সে আইনের দণ্ডকে হাতে নিতে পারবে না। অগণতান্ত্রিক দেশের পুলিশের চেহারা অনেকটা সামরিক বাহিনীর মতো। এখানে পুলিশই যেন একাধারে আইনের রক্ষক ও বিচারক।

পুলিশের ইতিহাস খুঁজতে প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসের উৎসমুখ পর্যন্ত পিছতে হয়। প্রাচীন মানুষ যখন নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবে পরিণত হয়েছিল তখন গোষ্ঠীর প্রয়োজনেই তাদের কিছু বিধি নিষেধ সৃষ্টি করতে হয়েছিল। এক গোষ্ঠীর সাথে আর এক গোষ্ঠীর লড়াই ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। ফলে গোষ্ঠীপিতাকে বিধি নিষেধের প্রয়োগের প্রশ্নে তার দলের যোদ্ধাদের উপরই নির্ভর করতে হতো।

মিশরের ফারাও তার আদেশ পালনের দায়িত্ব অর্পণ করতো সৈন্যবাহিনীর উপর। প্রাচীন যুগে রাজা পুরোহিত বা ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা জনগণের উপর তাদের হুকুম পালনের দায়িত্বভার অর্পণ করতো তাদের ভৃত্য বাহিনীর উপর।

খৃষ্টের জন্মের পূর্বেই যে আরক্ষা বাহিনীর অস্তিত্ব ছিল তার নিদর্শনও আছে। সীজার অগাষ্টাস রোম নগরীর নিরাপত্তার জন্য যে বিশেষ আরক্ষা বাহিনী গঠন করেছিলেন তা প্রায় ৩৫০ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল।

পুলিশের সম্পর্কে স্পষ্ট একটা ছবি কে প্রথম উপস্থাপিত করেছিলেন সেই প্রশ্নে সঠিক উত্তর দেওয়া হয়ত সম্ভব নয়। তবে ৭০০ থেকে ৮০০ খৃষ্টাব্দে আরক্ষা দপ্তরের উপর আইন প্রণয়নের দায়িত্ব সম্পর্কে সাধারণের মধ্যে যে নতুন একটা ধারণার সূত্রপাত হয়েছিল তার জনক হিসাবে ফ্রাঙ্কের নামই উচ্চারিত হয়। ব্রিটিশ ও মার্কিন পুলিশ ব্যবস্থা যে ফ্রাঙ্কের ধারণার উত্তরসুরী হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তা সেদেশের পুলিশের ইতিহাস থেকেই জানা যায়।

ভারতবর্ষের বর্তমান আরক্ষা ব্যবস্থা ইংরেজদের কাছ থেকে পাওয়া। তাই ইংল্যাণ্ডের পুলিশের ইতিবৃত্ত সম্পর্কে দু-একটি কথা মনে হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

ইংল্যাণ্ডে অতীতে প্রতি দশটি পরিবার নিয়ে গাঠিত হত একটি 'টিথিং' (Tithing)। একজনকে এর প্রধান নির্বাচন করা হত। তার নাম ছিল 'টিথিংম্যান'। দশটি টিথিং মিলে তৈরি হত 'হাণ্ড্রেড'। 'হাণ্ড্রেডের' প্রধানের নাম ছিল রীভ (Reve)। 'টিথিং' ও 'হাণ্ড্রেড' অবশ্য প্রয়োজনের তাগিদে তার এই বিভাজনের সীমারেখাকে খুব বেশি দিন বজায় রাখতে পারেনি। কোন কোন সময় একটি টিথিং-এর অধীনে প্রাথমিক স্তরের ১০টি পরিবারের পরিবর্তে ৫০ থেকে ৬০টি পরিবারও যুক্ত হয়ে পড়ত। একই ভাবে 'হাণ্ড্রেডের' পরিসীমার ক্ষেত্রেও অনেকদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে পড়েছিল। তখন রীভ রূপান্তরিত হয়েছিল 'কনেস্টবলে' আর 'টিথিং' হেড-কে বলা হত 'আণ্ডার কনেস্টবল'। অনেক গুলি 'হাণ্ড্রেড' মিলে পরবর্তী কালে তৈরি করেছিল শায়ার (Shire)। এই শায়ারই রূপান্তরিত হয়েছিল 'কাণ্ট্রি'তে। শায়ারের প্রধানকে বলা হত 'শায়ার রীভ'। শায়ার রীভই এর পরে রূপান্তরিত হয়েছিল শেরিফে।

প্রথম যুগে ইংল্যাণ্ডের অধিপতিরা ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের হাতে বিশাল জায়গা অর্পণ করতেন। ঐ সমস্ত অঞ্চলের শায়ার রীভদের নিযুক্ত করতেন সেই অঞ্চলের জমিদারেরা। আর যে অঞ্চলের কোন জমিদার থাকত না সেখানকার শায়াররীভ নির্বাচন হত রাজার ইচ্ছানুসারে।

আজকে যে 'ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ড' শব্দটি বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে তা এসেছে প্রাচীন ইংল্যাণ্ডের এই পুলিশী ব্যবস্থা থেকে। তখন টিথিং ম্যানদের উপর দিন ও রাতের পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হত। রাতের পাহারাদারিকে বলা হত ওয়াচ আর দিনের পাহারাদারিকে বলা হত ওয়ার্ড। ১৫ বছরের উর্দ্ধে যে কোন সবল পুরুষকে টিথিং ম্যান হিসাবে নিযুক্ত করা যেত। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রতিটি শহরের জন্য 'ওয়াচের' প্রয়োজন দেখা দিল। এই সমস্ত ওয়াচরা রাত্রিবেলায় যে কোন পথচারীকে প্রশ্ন করতে এবং সন্দেহজনক ব্যক্তিকে আটক করতে পারত।

কয়েক শতাব্দী ধরে ইংল্যাণ্ডের পুলিশী ব্যবস্থায় এই রীতি চালু ছিল। ১৮০০ সন পর্যন্ত লণ্ডন মহানগরীতে এই 'ওয়াচ' পুরকর্তৃপক্ষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। অপরাধ ও দুর্নীতির পরিমাণ ভয়াবহ ভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় পুলিশী ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের দাবি জোরদার হয়ে উঠে। ১৮২৯ সালে স্যার রবার্ট পীলের নেতৃত্বে লণ্ডন পুলিশ আধুনিক রূপ গ্রহণ করে। লণ্ডনের পুলিশ তাই এখনো রবার্ট পীলের ডাক নাম 'ববি' অভিধায় পরিচিত।

উপনিবেশবাদের সহজাত নিয়মানুসারে এদেশে ইংরেজরা যে পুলিশী ব্যবস্থা চালু করেছিল তা দেশের শান্তি রক্ষার প্রয়োজনের থেকে উপনিবেশ বাদের শেকড়কে নিরাপত্তাদানের তাগিদেই গড়ে উঠেছিল, ফলে পুলিশ নামটিই যেন নিপীড়নের সমার্থক শব্দে রূপান্তরিত হয়ে পড়েছে।

স্বাধীন ভারতের পুলিশের এই দুর্নামের বোঝা বয়ে বেড়াবার কথা নয়। পুলিশের দায়িত্ব নাগরিকের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে সুনিশ্চিত করা। তবু কেন পুলিশের বিরুদ্ধে আইনের ভক্ষকের অভিযোগ উঠে? মানুষের মনে পুলিশ সম্পর্কে একটা ধারণা বাসা বেঁধে বসে, পুলিশ হচ্ছে

সংগঠিত এক গুণ্ডা বাহিনী। মানুষ খুনের 'লাইসেন্স' নিয়ে সে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের যন্ত্র হিসাবে কাজ করে।

ঘুষ নেওয়া আইন বিরুদ্ধ। ঘুষ গ্রহণের অপরাধে পুলিশ কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে বিচারের জন্য প্রেরণ করার কথা। অথচ সেই পুলিশের বিরুদ্ধেই ঘুষ গ্রহণ করার অভিযোগ দিনের পর দিন জোরাল হয়ে উঠেছে। ধর্ষণ গুরুতর অপরাধ। ধর্ষণকারীকে বিচার বিভাগের সামনে হাজির করার দায়িত্ব পুলিশের। সে পুলিশের বিরুদ্ধেই আজ ধর্ষণের অভিযোগ। হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করে শাস্তির জন্য বিচারকের সামনে উপস্থিত করবে যে পুলিশ সেই পুলিশের বিরুদ্ধেই আজ হত্যার অভিযোগ।

অথচ পুলিশ মাত্রই ঘুষখোর নন। পুলিশ মাত্রই ধর্ষণকারী নন। পুলিশ হলেই তিনি হত্যাকারী নন। বরং অধিকাংশ পুলিশই সৎ। নারীর মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। নাগরিকের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষায় সমর্পিত প্রাণ।

পুলিশ কেন জনগণের হৃদয়ে বন্ধুত্বের আসন পায় না? আজকে যে রাজনৈতিক নেতা পুলিশের ঘনঘন সেলাম পেয়ে আপ্লুত হন তাকেই আবার রাজনৈতিক গুটির চাল উল্টে গেলে সেই একই পুলিশের লাঠির আঘাতে রাস্তায় লুটিয়ে পড়তে হয়। কেন? তবে কি পুলিশ মানে তারা রাষ্ট্রযন্ত্রের ইচ্ছা-অনিচ্ছার হাতিয়ার?